মাতৃপ্রসঙ্গ

মাতৃজাতির সমস্যা ও তার সমাধানে শ্রীশ্রীমা

প্রব্রাজিকা বিমোক্ষপ্রাণা

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সাধনার শেষ কথা মাতৃভাব। রামকৃষ্ণ অবতারে তাই মাতৃভাবে সাধন, স্ত্রীগুরুকরণ ও সহধর্মিণীকে মাতৃভাবে পূজা। স্বামী বিবেকানন্দও একই ভাবের কথা বলেছেন—নারীর পূজা করেই সব দেশ, সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে নারীরা পূজিত হন না, সে-দেশ কখনই বড় হতে পারেনি, কোনওদিন পারবেও না। স্বামীজী ভারতবর্ষের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন নারীর অবমাননাকে। তাই এই যুগে শ্রীশ্রীমা মাতৃভাবের মহিমা, গরিমা ও মাধুর্য প্রকাশের জন্য নিজে মাতৃরূপে এসে বিশ্বমানবকে মাতৃভাব শিখিয়ে গেলেন। এই মাতৃভাবই নিশ্চিতরূপে পারে বিশ্বের সমস্ত সমস্যার যথাযথ সমাধান করতে। মানবসভ্যতার আদি শিক্ষক মা। তাই আদর্শ মা না হলে আদর্শ সন্তানও জন্মায় না। ফলে অনিবার্যভাবে আদর্শ সমাজ গঠিত হয় না। এদিক থেকে দেখলে মাতৃত্বই নারীর আদর্শ ও জীবনের পূর্ণতা।

বর্তমান যুগের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রকট সমস্যা হল নারীজাতির সমস্যা। বৈদিক যুগে নারীপুরুষ সর্ব বিষয়ে সমান স্বাধীনতা পেয়ে থাকত। তারপরে বিভিন্ন কারণে, প্রয়োজনে বা নিতান্ত অপ্রয়োজনে নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ইতিহাসের অন্ধকার যুগের মতো এই বঞ্চনার যুগও সুবিস্তৃত ও ঘোর তমসাচ্ছন্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পুনরায় নারীজাগরণের সূচনা হয়। বাংলার নারীজাগরণ অতি অবশ্যই উনিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের অন্যতম অবদান। কুসংস্কারের জীর্ণ অনুশাসনে আবদ্ধ, সামাজিক অত্যাচারে জর্জরিত, শিক্ষায় বঞ্চিত, অবহেলিত নারীসমাজ ক্রমে ক্রমে নতুন আলোর, নতুন পথের দিশা পেয়েছে। পাশ্চাত্যের নারীমুক্তি আন্দোলনের ঢেউও আছড়ে পড়েছে ভারতের বুকে। তাই জীবনের নব নব দিকে তাদের নব নব অভিযানের সূত্রপাত দেখা যায়।

কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে দেখি, প্রগতির প্রবাহে দিশাহারা বর্তমান নারীসমাজ অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা, সতীত্ব, নিঃস্বার্থপরতা—এই সবকিছু থেকে, এককথায় সনাতন ঐতিহ্য থেকেই ভারতীয় নারীর বিচ্যুতি লক্ষ করা যাচ্ছে। সে আজ বিদেশি সমাজের জীবনধারা অনুকরণে প্রলুব্ধ। অবশ্য যখনই কোনও ক্ষেত্রে নবজাগরণ ঘটে, তার অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা যায় উত্তেজনা, উদ্দামতা,

উচ্ছৃঙ্খলতা। ভারতীয় নারীর ক্ষেত্রে অন্তঃপুরের আড়ালে জেগেছিল অবরোধ থেকে মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আর বাইরেও সমাজসংস্কারকরা ভেবেছেন, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কোনখানে টানা হবে তার সীমারেখা? ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য ধ্বংস করা অনুচিত। এগিয়ে চলার তাগিদে সেই সনাতন ধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাবধারা যুক্ত করে, কুসংস্কারমুক্ত ভবিষ্যৎ সমাজে নারীর যথার্থ রূপটি কী হওয়া উচিত—এই প্রশ্ন বর্তমান যুগের মতো উনিশ শতককেও আন্দোলিত করেছে। এমনই একটি যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীশ্রীমার আবির্ভাব। তাঁর জীবন নানারকম পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে একটি সমন্বয়ের সন্ধান দিতে পেরেছে। তাঁকে দেখে মুগ্ধ ভগিনী নিবেদিতার মনে হয়েছে, শ্রীশ্রীমা ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম বাণী। আবার মায়ের মধ্যে একইসঙ্গে ভারতীয় নারীর শাশ্বত আদর্শ ও অতি উদার আধুনিকতা দেখে এই প্রশ্নও তাঁর মনে জেগেছে যে, তিনি কি পুরনো আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, না নতুন কোনও আদর্শের অগ্রদূত?

আজ আদর্শবিক্ষুব্ধ জগতে সর্বাধিক দুরূহ কাজ হয়তো এই, কাকে নির্বাচন করব 'জীবনের ধ্রুবতারা' রূপে? এক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন একটি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের মতো। হয়তো তাঁর অনুপম চারিত্রিক গুণাবলি অবলম্বন করেই নারীজাতির মহান ও বিরাট ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ষোড়শীপূজার মাধ্যমে। আর শ্রীশ্রীমায়ের জীবদ্দশাকালেই স্বামীজী জগতের নারীজাতির সঙ্গে তাঁর জীবনের সম্বন্ধ সার্থকভাবে নিরূপণ করেছিলেন : ''...শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না।... মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।''

নারী তার জীবনে নানা ভূমিকা পালন করে থাকে—কন্যা, ভগিনী, পত্নী, জননী। স্নেহ, প্রীতি, মমতা, বাৎসল্য, সেবা, কর্মনিষ্ঠা, ধর্মানুরাগ—এসবই নারীচরিত্রের বিভিন্ন দিক। এইসকল গুণগুলি সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে একটি নারীর মধ্যে একত্রিত হলে সে অপূর্ব সুষমায় মানবসমাজকে পরিপুষ্ট করতে থাকে। শ্রীশ্রীমা নিজ জীবনে একই সঙ্গে এই বিভিন্নমুখী গুণাবলিকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিলেন।

সাধারণ মানুষ স্বতই দৈনন্দিন তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। আর আজ তো সমাজে নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পরিমাণ সীমাহীন। কারণ লোভ, অন্যায় ও পাপবোধের সামান্যতম ধারণা সম্বন্ধে আজ আমরা কাণ্ডজ্ঞানরহিত। মনে হয়, এই অধঃপতন থেকে সমাজকে উদ্ধার করার জন্যই শ্রীশ্রীমা লজ্জা, বিনয়, সদাচার, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

অনেকের মনেই প্রশ্ন উদিত হতে পারে যে, শ্রীশ্রীমা কী করে আধুনিক নারীর আদর্শ হবেন? মা তো গ্রাম্য, অশিক্ষিত এবং সর্বোপরি অকুণ্ঠ ধর্মভাবে নিমজ্জিত। এদিকে পৃথিবী আজ অনেক এগিয়ে গেছে। ধরণী আজ সত্যই ধরা দিয়েছে 'Global Village'-এর ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে। পুরনো সংস্কারগুলির উচ্ছেদে ব্রতী একাল। ধর্মের আফিম খেতে মোটেও রাজি নন প্রগতিবাদী নারীগণ।

এর উত্তরে বলা যায়, শ্রীশ্রীমা-ই হবেন আধুনিক নারীর আদর্শ, কারণ তাঁর জীবন ও বাণীতে পাই আধুনিক জীবনের অস্থিরতার মধ্যে স্থিরত্বের আশ্বাস, যুগযন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তারের উপায় এবং যন্ত্রণাবর্তের মধ্যে শান্তির নিলয়। কীভাবে? সঠিকভাবে এর উত্তর নির্ণয় করতে হলে সর্বপ্রথমে যুগসমস্যা সম্বন্ধে জানতে হবে।

আজ মানুষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা ভোগের ক্ষেত্রে উন্মত্ত। তার

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নিত্যনতুন ভোগ্যপণ্যের দুর্নিবার আকর্ষণ। এতে অধ্যাত্মজীবনের সুকঠিন পথ থেকে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জীবন গঠনকারী আদর্শ। সংযম, পবিত্রতা প্রভৃতি শব্দগুলি তার অভিধান থেকে নির্বাসিত হচ্ছে। তার কাছে এগুলি প্রাচীন যুগের ভ্রান্তিকর খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং এগুলিকে জীবনে প্রয়োগ করার অর্থ জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়া। মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। এর সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত হয়েছে।

মেয়েরা এখন পুরুষদের আচরণ অনুকরণ এবং সমাজজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দ্বারা নিজেদেরকে পুরুষদের সঙ্গে সমান প্রমাণিত করার জন্য একান্ত ব্যগ্র। হয়তো তারা প্রাচীন বাধানিষেধের বন্ধন থেকে সবেমাত্র মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে বলে, সেই আনন্দলাভের আতিশয্যে ভুলতে বসেছে যে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় তাদেরও কিছু অবদান আছে। 'Survival of the fittest'-এর প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়ে তারা প্রকৃতপক্ষে 'Natural Law'-কে উলটো করে দিতে বসেছে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি—পাশ্চাত্যে নারীদের তাঁর নারী বলেই মনে হত না, তারা যেন পুরুষের অবিকল নকলমাত্র। কিন্তু এই অবস্থা আজ আর শুধু পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সীমাবদ্ধ নয়। যদিও স্বামীজী বলেছিলেন, একমাত্র ভারতেই নারীদের লজ্জা, বিনয় ও নম্রতা চোখকে তৃপ্ত করে; তবু আজ আমরা সভয়ে দেখছি যে পাশ্চাত্যে যে-স্রোত বইছে তা আমাদের দেশেও প্রবেশ করেছে এবং এই চোরাবালির অতল গহ্বরে সমগ্র সমাজ তলিয়ে যেতে বসেছে।

আধুনিক যুগের একটি বড় সমস্যা বিচ্ছিন্নতা। আমরা যেন সবাই একা একা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করি এবং কারও মানসিক যন্ত্রণার শরিক হওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনাও আমাদের নেই। মজার কথা হল সকলেই স্বেচ্ছায় এই নির্বাসন নিয়েছি অথচ সকলেই একাকিত্বের যন্ত্রণায় বিদ্ধ। এ থেকেই জন্ম নিচ্ছে মারাত্মক সব অসুখ—Melancholia, Schizophrenia ইত্যাদি। বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণার শিকার আধুনিক মেয়েরাও—বিশেষত সমাজের ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত মেয়েরা। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবনকে পরম পাথেয় বলে গ্রহণ করে এবং উগ্র আধুনিকতার নেশায় তারা আজ পানাসক্ত কিংবা ড্রাগের কবলে আক্রান্ত। কেন তারা উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমতী হওয়া সত্ত্বেও এই ধ্বংসের পথ বেছে নিচ্ছে? তাদের জীবনে যশ, প্রতিষ্ঠা, সম্পদ কিছুরই তো অভাব নেই। তবুও জীবন কেন এত অর্থহীন হয়ে উঠল? সব থেকেও কী যেন নেই! এই না পাওয়ার নৈরাশ্য মানুষকে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তুলছে। স্বামী-স্ত্রী একই ছাদের তলায় থেকেও কেউ কারও আপন নয়। পরস্পরের মানসিক দূরত্ব সহস্র সহস্র যোজন। অতি প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিতে হয় সোশ্যাল মিডিয়ার মারফত। এর কারণ দুজনেরই স্বার্থত্যাগের অভাব। তারা বৃথা সুখের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় আর সন্তানকে ঠেলে দেয় নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যে। নেই ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে অনায়াসেই তাই ঘর ভাঙে। আজ মহামারিরূপ ধারণ করেছে বিবাহবিচ্ছেদ। অতি শৈশবেই 'সিংগল প্যারেন্ট'-এর মতো অদ্ভুত ধারণার সঙ্গে পরিচিত আজকের শিশুরা। অথচ ভারতের বাঁচবার পথ তো এই নয়। জীবনকে ভালবাসতে হবে, তাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিরও আমূল পরিবর্তন করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকবে সেই দায়িত্বশীল মধুর সম্পর্ক—যা পরিণামে কল্যাণবারি সিঞ্চিত করবে গোটা সমাজের বুকে।

এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে যেখানে গৃহস্থাশ্রমীরা পালন করে গেছেন ইতিবাচক, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল

আনন্দময় জীবন। এক্ষেত্রে মনে হয় মূলমন্ত্র হল 'আত্মত্যাগ', শ্রীশ্রীমায়ের জীবন যে-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। সম্পূর্ণ আত্মবিলয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য সহধর্মিণী। শ্রীরামকৃষ্ণেরও স্ত্রীর প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভালবাসা। তাঁরা জীবন দিয়ে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, কেমন করে সংসারে স্বামী-স্ত্রী বাস করবে, কেমন করে একে অন্যের পরিপূরক হবে। কেউ কারও চেয়ে খাটো নয়—এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লড়াই বন্ধ করতে হবে। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্যকে সব সময়ে প্রাধান্য দিলে চলে না। শ্রীমা নিজের প্রাত্যহিক আচরণে সে-শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি বলতেন, সহ্যের সমান গুণ নেই আর সন্তোষের সমান ধন নেই। এ যেন সনাতন শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার আশ্চর্য মেলবন্ধন। 'সহ্য' এবং 'সন্তোষ' কথা দুটি আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ শব্দ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা মানুষের জীবনে সদর্থক বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ। এগুলি দৈনন্দিন জীবনে যদি একটু সচেতনতা ও ধৈর্যের সঙ্গে পালন করা যায় তাহলে তা অতি অবশ্যই আশ্চর্য ফল প্রসব করবে এবং আমাদের চিরকাঙ্ক্ষিত শান্তির রাজ্যে উপনীত করবে।

যেমন একটি অতি সাধারণ সমস্যা হল বধূ-শ্বশ্রূমাতার পারস্পরিক সম্পর্ক। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো কেউই মন্দ নন কিন্তু একসঙ্গে বসবাস করলেই নানাবিধ দুরতিক্রম্য সমস্যার উদয় হয়। তার একমাত্র সমাধান নিহিত থাকে পৃথক স্থানে জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে স্নেহ-প্রীতি ভালবাসা প্রভৃতি অপূরণীয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় পরবর্তী প্রজন্ম। তাদের সবাই থেকেও মানুষ হতে হয় হৃদয়হীন পরিচারিকার হাতে—প্রায় অনাথের মতোই। কিন্তু শ্রীশ্রীমা সবাইকে নিয়ে ঘর করেছেন। নহবতের ওপরের ঘরটিতে তাঁর শাশুড়ি মা থাকতেন। যখনই তিনি ডাকতেন মা ছুটে যেতেন। তাড়াহুড়োতে কতবার দরজায় মাথা ঠুকে কেটে গিয়েছে! এই ভালবাসা, শ্রদ্ধাকে কি কোনও শাশুড়ি উপেক্ষা করতে পারবেন? আরও একজন শাশুড়ির সঙ্গে ঘর করেছেন শ্রীমা। ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণের 'গুরু মা'। খুব ঝাল দিয়ে তিনি রান্না করতেন এবং উগ্র স্বভাবের ছিলেন। স্বভাবতই রামলাল-জননী প্রমুখ তাঁর রান্না খেতে পারতেন না এবং তাঁকে তা জানাতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী তা মানতে রাজি নন, তিনি বউমাকে সাক্ষী মানতেন। মা কিন্তু কোনওদিন তাঁর রান্নার নিন্দা করেননি। ঝালের আধিক্যে জলঝরা চোখে বলতেন, ''বেশ হয়েছে।'' কোনওদিন মা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এই নিয়ে কোনও সমস্যার কথা বলেননি। আবার যখন পরবর্তী কালে সংসারে গৃহকর্ত্রীরূপে অনেক পুত্রবধূসম বা কন্যাসম মেয়েদের নিয়ে ঘর করেছেন তখনও তাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য পৃথক হাঁড়ির ব্যবস্থা করেননি। দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনাবলি থেকে কী করে নিজেকে নিরাসক্ত রাখা যায় এবং গৃহশান্তি বজায় রেখে সবাইকে নিয়ে চলা যায়, সেটি মা দেখালেন।

আজ আরও একটি সমস্যা হল পিতা-মাতাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো। এক্ষেত্রে ভালবাসা, সেবা, কর্তব্য—এই সবকিছুই মায়ের জীবন থেকে শেখা যায়, যা কিনা বাবা-মায়েদের প্রাপ্য।

আর একটি কথা মা বলতেন : ''মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কথা বলতে আছে?'' সত্য হলেও অপ্রিয় কথা বলতে নেই। মানুষের চক্ষুলজ্জা ভেঙে গেলে তার মুখে কিছু আটকায় না। এসব কথা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে অত্যন্ত উপযোগী।

মা ছিলেন অপরের গুণগ্রাহী। বলতেন, লোকে কেবল দোষ দেখে, গুণটি দেখা চাই, বা ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? আমাদের মনে হতে পারে, এই কথাগুলি বলতে পারা সহজ, কার্যে

পরিণত করা রীতিমতো কঠিন। কিন্তু মা তাঁর নিজের জীবনে এই সুকঠিন কাজটি নিত্য অনুষ্ঠান করেছিলেন অবলীলায়। আসলে ভালবাসাই হল সেই জাদুমন্ত্র, যার দ্বারা অপরের দোষ ধরার কু-অভ্যাসটি থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। আজ পৃথিবী থেকে ভালবাসা শব্দটি মুছে যেতে বসেছে। মানুষ যেকোনও সম্পর্কের ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে চূড়ান্ত স্বার্থপর। অথচ স্বার্থত্যাগ ও ভালবাসার মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একটি না থাকলে অপরটি কোনওমতে আসতে পারে না। তাই আজকের এই ভালবাসার খরা-অধ্যুষিত পৃথিবীর একান্ত প্রয়োজন 'ভালবাসায় ভরা মা'-কে।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেছিলেন : ''তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?'' শ্রীশ্রীমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, তিনি তাঁকে ইষ্টপথে সাহায্য করতেই এসেছেন। এখানেই তিনি স্বমহিমায় ভাস্বর। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা, কিন্তু অপরূপ আত্মমর্যাদায় মণ্ডিত। তিনি যুগাবতারের লীলাসঙ্গিনী, সম্পূর্ণ স্ব-ইচ্ছায় স্বামীর জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে নিজের জীবন দিয়েছিলেন। অথচ তাঁর স্বাধীন মনোভাব সম্পূর্ণভাবেই ছিল। তিনি যেমন আদর্শস্থাপনের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে সহযোগিতা করেছিলেন তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে যোগ্য অর্ধাঙ্গিনীর সম্মান দিয়েছেন। অতুলনীয় এই দাম্পত্যজীবনের উদাহরণ কি আর পাওয়া যাবে? সংশয়াকুল মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে আমরা সাধারণ মানুষ হয়ে কীভাবে এরকম অসাধারণ জীবন যাপন করব? এর উত্তরে বলা যায়, তাঁরা এসেছিলেন 'তাপিতের তরে নররূপ ধরে', সুতরাং এমন কিছু তাঁরা করেননি বা বলেননি যা আমরা করতে পারব না। শুধু প্রয়োজন আন্তরিক ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে ছিল যুক্তিবোধ—যা তাঁর ব্যক্তিত্বে ফুটে উঠত এবং যা এখনকার সমাজে বিশেষত মেয়েদের খুবই প্রয়োজন। এ-কাল ও সে-কালের মধ্যে কত তফাত—এই বৃথা তর্কে কালক্ষেপ না করে দরকার শ্রীশ্রীমায়ের আধুনিক মন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এই যুক্তিবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর দূরদর্শিতা। দূরদর্শী হওয়ার জন্য ত্রিকালজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন উদার, খোলা এবং কুসংস্কারমুক্ত মন। মা তথাকথিত সমাজসংস্কারক ছিলেন না। সমাজে প্রচলিত অনেক প্রথা মা নিষ্ঠাভরে পালন করলেও যুক্তিহীন কোনওদিনই ছিলেন না। এটাই কি আধুনিকতার সঠিক সংজ্ঞা নয়? তুচ্ছ আচারকে গ্রাহ্য না করে সমগ্র বিশ্বের প্রয়োজনে স্বামীজীকে তিনি কালাপানি পার হওয়ার অনুমতি দিলেন এক বাক্যে; যেখানে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বরেণ্য মানুষ বলেছিলেন, সন্ন্যাসী হয়ে ম্লেচ্ছ দেশে যাওয়া উচিত নয়। বালগঙ্গাধর তিলক বা মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজসংস্কারকদেরও ইউরোপীয়দের সঙ্গে চা-পানের পর রীতিমতো প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠতে হয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে যে শ্রীশ্রীমার মতো রক্ষণশীল গ্রাম্য বিধবা কী করে সম্ভব করলেন এরকম যুগান্তকারী বিপ্লব? আসলে চিত্তকে যা সংকীর্ণ করে তা কখনও ধর্ম হতে পারে না। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই উদার স্বচ্ছ মানবিক দৃষ্টির ফলেই অন্ধ কুসংস্কার, জাতপাত, ছুৎমার্গ, দেশাচার ও যুক্তিহীন প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে শ্রীমায়ের ছিল এক সংগ্রামী ভূমিকা। যথার্থ বিপ্লব সম্পাদিত হয় মানসিকতার আমূল পরিবর্তনে। কারণ বন্দুকের নল নয়—আত্মজয়ীর মনই হল সকল শক্তির উৎস। এদিক থেকে বিচার করলে শ্রীমা ছিলেন এক অতুলনীয় বিপ্লবী। নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে, বিনা প্রচারে তাঁর সামাজিক বিপ্লব সাধনা।

শ্রীশ্রীমায়ের আধুনিকতা আজকের মেয়েদের অনুকরণযোগ্য। এই আধুনিকতার অর্থ বিপরীত

স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও জয়লাভ। এজন্য চাই অসীম ধৈর্য ও সহ্য। ভাইদের স্বার্থবুদ্ধি, অর্থলিপ্সা, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের পারস্পরিক ঝগড়া, পাগলি মামির পাগলামি, রাধুর অবুঝ আবদার, নলিনীদির শুচিবায়ু রোগ—এমন এক সংসারে থেকেই সংসারকে অতিক্রম করার সাধনা করেছিলেন শ্রীশ্রীমা। যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন—তাঁর এমন বাক্যবন্ধের পর 'অ্যাডজাস্টমেন্ট'-এর আলাদা কোনও অর্থ বোঝানোর দরকার হয় না। মা যা বলেছেন, তার কতগুণ পালন করেছেন—তা আমাদের বোধের অগম্য। তাই মায়ের জীবন দেখে এইটিই মনে হয় যে আধুনিকতার অর্থ হল সহজ, স্বাভাবিকভাবে জীবনকে তার সবটুকু নিয়ে গ্রহণ করতে হবে, ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়ে নয়।

আজ মেয়েরা পুরুষের অন্যায় জুলুম, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, আত্মরক্ষার অধিকার চাইছে, কিন্তু অনেক আগেই শ্রীশ্রীমা তার জন্য পথ প্রস্তুত করে গেছেন। উদ্বোধন বাড়ির কাছে বস্তিতে একবার একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ভীষণভাবে মারধোর করছিল। মা জপ ছেড়ে ছুটে এলেন। নির্মমভাবে তাকে ভর্ৎসনা করলেন। আবার পুরুষের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য যে তেজোদৃপ্ত মূর্তি ধরতে হয়, মা তা দেখিয়েছেন হরিশের ঘটনায়। শ্রীশ্রীমার তেজস্বিতা আমরা আরও প্রত্যক্ষ করেছি সিন্ধুবালার প্রসঙ্গে। গর্ভবতী সিন্ধুবালাকে গ্রেপ্তার করে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ মা করেছিলেন অগ্নিমূর্তি ধরে। শ্রীশ্রীমায়ের ব্যক্তিত্বের কঠিন কোমল রূপটি আজকের মেয়েদের প্রধান অস্ত্র করে তুলতে হবে।

আধুনিক জীবনযন্ত্রণার আর একটি বড় কারণ হল চাহিদা। আজ চতুর্দিকে অর্থলোলুপতা দেখলে মায়ের সেই কথাটিই বারবার মনে পড়ে : চাকি না পারে এমন কোনও কাজ নেই, প্রাণসংশয় পর্যন্ত। মায়ের কোনও চাহিদা ছিল না। আমরা মায়ের জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই তিনি শুধু পরের জন্য নিরলস সেবা করে যাচ্ছেন এবং এতেই তাঁর হৃদয়ের আনন্দঘট উপচে পড়ছে।

সবারই তো সকল কর্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এই আনন্দলাভ। তাহলে সবরকম চেষ্টা করেও, ঘরে বাইরে এত কষ্ট করেও কেন এই আনন্দ বা শান্তি অধরাই থেকে যাচ্ছে? এ-প্রশ্নের সমাধান করতে বসে মায়ের জীবনদর্শনেরই শরণাপন্ন হতে হবে কেননা তিনিই ছিলেন প্রকৃত শান্তির অধিকারিণী। মায়ের জীবনের মূলকথাটি হল, জীবনের আনন্দ ভোগে নয়—ত্যাগে, ভালবাসার অর্থ আত্মতৃপ্তি নয়—আত্মত্যাগ। শ্রীরামকৃষ্ণ মাকে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই জগৎজোড়া সন্তানের মা হওয়ার অধিকার দিয়ে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে শিখিয়েছিলেন কারও কাছে চিতহাত না করতে। তাঁর দেহত্যাগের পর চরম দারিদ্র্যেও মা সে-আদেশ লঙ্ঘন করেননি। কখনও সে-বঞ্চনার ইতিহাস কারও কাছে প্রকাশও করেননি। ধৈর্য ও সংযমের প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীমাকে অনুসরণ করলে বর্তমান অর্থগৃধ্নুতা-জনিত সমস্যাগুলির অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা যাবে। সমাজে পণপ্রথার জন্য হত্যা ও আত্মহত্যা আজও অব্যাহত। যতদিন না মানুষ লোভ রিপুর ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারছে এবং নিজের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারছে ততদিন সমাজে এই অবস্থা চলবে যেখানে মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক বেশি দামি হল অর্থ বা বস্তু। শ্রীশ্রীমার জীবন চাহিদাকে জয় করার জ্বলন্ত আদর্শ। মা বলছেন নির্বাসনা হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে। কারণ এই নির্বাসনাই পারে মানুষের সকল চাওয়ার অবসান ঘটিয়ে তাকে সব পাওয়ার রাজ্যে নিয়ে যেতে।

আদর্শ জননীই পারেন উন্নত চরিত্রের সন্তানের

জন্ম দিতে। আজ যে আমরা আদর্শ সন্তান দেখতে পাই না, তার অন্যতম কারণ হল 'আদর্শ মা' নেই। সন্তান আদর্শ মানুষ হবে কি না তা নিয়ে আজকাল বাবা-মায়ের মাথাব্যথা দেখা যায় না, তাঁরা বরং নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বোঝা সন্তানের মাথায় চাপিয়ে দিতে ব্যস্ত। শ্রীশ্রীমা ছিলেন 'আদর্শ মা'। ভাল ছেলের মা হওয়ার কৃতিত্ব সবাই নিতে চান। কিন্তু শ্রীমার মতো কজন বলতে পারেন যে ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে তবে তাঁকেই তা ঝেড়ে তাকে কোলে নিতে হবে? আবার জীবনযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় যখন কেউ পর্যুদস্ত হয় তখন সবসময় কি সে তার মাকে পাশে পায়? শ্রীশ্রীমা কিন্তু সবসময় তাঁর সকল সন্তানের পাশে আছেন—সে জীবনযুদ্ধে জয়ীই হোক বা পরাজিত বিধ্বস্তই হোক। কতজন মা বলতে পারবেন যে তাঁর শরৎও যেমন ছেলে আমজাদও তেমন? শরৎ অর্থাৎ স্বামী সারদানন্দ ব্রহ্মবিদ, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক, শ্রীমায়ের তত্ত্বাবধানকারী প্রধান সেবক। আর আমজাদ? একটি সাধারণ চোর। তাই মনে হয় স্বামীজী বলেছিলেন, ''তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই।''

আজকের মেয়েরা অনেকেই পাশ্চাত্যের অনুসরণে বিবাহে অনিচ্ছুক বা মা হতে অরাজি নিজের 'কেরিয়ার' তৈরিতে অসুবিধে হবে বলে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্য নারীরাও আজ জীবনাদর্শের জন্য ভারতের দিকেই ফিরে তাকাচ্ছে। শ্রীশ্রীমা অবশ্য সব রাস্তাই বাতলে দিয়েছেন। এক মহিলাকে তাঁর মেয়েদের বিয়ে দিতে না পেরে চিন্তিত দেখে মা বলেছিলেন, ''বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও—লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।'' নিবেদিতা স্কুলের দুটি কুড়ি-বাইশ বছরের মাদ্রাজি কুমারী মেয়েকে দেখে মা সুখী হয়েছিলেন। আর দুঃখ করেছিলেন : ''আহা, তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখেছে। আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছর হতে না হতেই বলে, 'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও!' '' অর্থাৎ যদি কোনও মেয়ে বিয়ে না করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জীবন গঠন করতে চায়, তবে সেই প্রগতিমূলক জীবনের সন্ধানও মা দিয়ে গেছেন। শ্রীশ্রীমা প্রকৃত স্বাধীন সত্তার অধিকারী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন নারীকে। তিনি চাইতেন মেয়েরা নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করবে, পুরুষের সাহায্য না নিয়ে। যখন গৌরী মা তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে আশ্রম করেন তখন মা বলেছিলেন, ''মেয়েদের বুঝিয়ে দিও তারা কেবল থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় করতে আসেনি।'' মায়ের আদর্শকে অনুসরণ করে যে-সব সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে (শ্রীসারদা মঠ, সারদেশ্বরী আশ্রম ইত্যাদি) সেগুলি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন।

স্বামীজীর উদ্দীপনাময়ী ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল, মাকে অবলম্বন করে আবার গার্গী, মৈত্রেয়ীর জন্ম হবে। এতে আমরা মানবজাতির এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র দেখতে পাই। যেসব সুপরিচিত আধ্যাত্মিক আদর্শের পুনরুজ্জীবন মায়ের জীবনে দেখা গিয়েছে, ভারতীয় নারীর জীবনেও যথাকালে ওই আদর্শগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের মন্তব্যটি স্মরণীয় : ''আজকাল আমাদের দেশের মেয়েরা আগেকার মতো কেবল রান্নাঘরে আবদ্ধ না থেকে বাইরে কাজকর্মে নানাদিকে এগিয়ে আসছেন।... এ প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু এইসব করতে গিয়ে তাঁদের নিজস্ব আদর্শ ভুলে যাবার ভয়ও আছে। সেইজন্য—মা আদর্শ জীবন দেখিয়ে গেলেন—যেন আদর্শের একটি ছাঁচ তৈরি করে রেখে গেলেন।'' সেই ছাঁচে ঢেলে নিজেদের জীবন গড়ে মেয়েরা যুগসমস্যার সমাধান করুক, মাতৃচরণে এই প্রার্থনা।